বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক গতিধারা

Macroeconomic Trends of Bangladesh Economy

৭

ভূমিকা

Introduction

সামষ্টিক অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হলো জাতীয় আয়। একটি দেশের জাতীয় আয় নির্ধারণ করা যেকোনো দেশের অর্থনীতির জন্য অতীব জরুরি কারণ প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা অপরিহার্য। যেকোনো দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা করতে হলে সেই দেশের জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানতে হয়। একটি দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন (জিএনপি), মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি), নীট জাতীয় উৎপাদন (এনএনপি), নীট দেশজ উৎপাদন (এনডিপি) প্রভৃতি জানা থাকলে ঐ দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র পাওয়া যায়। সামষ্টিক অর্থনীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সঞ্চয় ও বিনিয়োগ। জাতীয় আয় ধারণার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ধারণা এটি। আমরা জানি আয় থেকে ভোগ ব্যয় বাদ দিলে সঞ্চয় পাওয়া যায় যা বিনিয়োগ ব্যয় হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ দিন

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৭.১ : বাংলাদেশের জাতীয় আয়
পাঠ ৭.২ : জাতীয় আয় পরিমাপে সমস্যা
পাঠ ৭.৩ : সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

মুখ্য শব্দ	জাতীয় আয়, জিএনপি, জিডিপি, সঞ্চয়, বিনিয়োগ ইত্যাদি।

পাঠ-৭.১ বাংলাদেশের জাতীয় আয়
National Income of Bangladesh

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জাতীয় আয় সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন;
- জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধরন ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহের বিবরণ দিতে পারবেন।

জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা
Definition of National Income

একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি দেশের সমস্ত জনগোষ্ঠী প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে চূড়ান্তভাবে যে পরিমাণ বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যকে ঐ দেশের জাতীয় আয় বলে। বস্তুগত দ্রব্য বলতে যেসকল দ্রব্যের আকার-আকৃতি, ওজন রয়েছে সেগুলোকে বোঝানো হয়েছে। যেমন- কাপড়, চাল, গম, ইত্যাদি। অপর দিকে অবস্তুগত দ্রব্য বলতে মূলত সেবাসমূহকে বোঝানো হয়েছে। যেমন- ডাক্তারের সেবা, শিক্ষকের শিক্ষাদান ইত্যাদি। এখানে চূড়ান্ত দ্রব্য বলতে ভোগযোগ্য দ্রব্যসামগ্রীকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, কোন দ্রব্যের মধ্যবর্তী দ্রব্যের হিসাব বিবেচনা না করে বরং চূড়ান্ত দ্রব্যকে বিবেচনা করতে হবে। মূলত বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে কোন দেশে একটি নির্দিষ্ট বছরে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম সৃষ্টি হয় তার আর্থিক মূল্যের সমষ্টি হলো জাতীয় আয়।

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন ভাবে জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা দিয়েছেন। যেমন-

নিউ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মার্শালের মতে, “The labour and capital of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial is called national income .”

অর্থাৎ, তার মতে কোনো দেশের জমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি উপকরণের সাহায্যে এক বছরে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপন্ন হয় তার সমষ্টি হলো জাতীয় আয়।

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক পিগু বলেছেন, “National Income is that part of the objective income of the country including of course, income derived from abroad which can be measured in money.”

অর্থাৎ, “জাতীয় আয় হলো বিদেশ থেকে প্রাপ্ত আয়সহ সমাজের বৈষয়িক আয়ের সেই অংশ যা অর্থের মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য”।

জাতীয় আয় যেহেতু একটি প্রবাহমান ধারা, তাই অধ্যাপক পল এ স্যামুয়েলসন বলেছেন, ”একটি দেশের আর্থিক মূল্যে পরিমাপযোগ্য দ্রব্য ও সেবাসামগ্রির বার্ষিক সর্বমোট প্রবাহই হলো জাতীয় আয়”।

জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণা
Different Concepts of National Income

একটি দেশের জাতীয় আয় বা উৎপাদন বিভিন্নভাবে প্রকাশ করা হয়। জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ধারণা রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্নকারণে আলোচনায় স্থান পায়। পরপৃষ্ঠায় জাতীয় আয়ের কতগুলো ধারণা বিশ্লেষণ করা হলো।

১. জিএনপি বা মোট জাতীয় উৎপাদন
(GNP or Gross National Product)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত: এক বছরে একটি দেশে যে পরিমাণ চূড়ান্ত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় তার সমষ্টি হলো মোট জাতীয় উৎপাদন। মোট উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রি ও সেবাকর্মকে তাদের গড় মূল্য দিয়ে গুণ করলে পাওয়া যায় জিএনপি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- যদি একটি দেশের উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাসমূহ $X_1+X_2+..........+X_n$ হয় এবং তাদের মূল্য যথাক্রমে $P_1+P_2+...........+P_n$ হয় তবে সেই দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন হবে নিম্নরূপ-

$$GNP = \sum X_iP_i = X_1P_1+X_2P_2+ .... +X_nP_n$$

এখানে, X_1= n সংখ্যক x দ্রব্য

P_1= n সংখ্যক x দ্রব্যের মূল্য।

২. নীট জাতীয় উৎপাদন
Net National Prduct (NNP)

মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে মূলধনের অবচয়জনিত ব্যয় বাদ দিলে পাওয়া যায় নীট জাতীয় উৎপাদন। মোট জাতীয় উৎপাদন করতে সারা বছর ধরে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে যন্ত্রপাতির অবচয়জনিত কারণে প্রকৃত মূল্য হ্রাস পেতে থাকে। দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখতে হলে মোট জাতীয় উৎপাদনের কিছু অংশ মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য কর্তন করতে হয়। একে মূলধনের অবচয়জনিত ব্যয় বলে। সুতরাং,

নীট জাতীয় উৎপাদন = মোট জাতীয় উৎপাদন − মূলধনের অবজয়জনিত ব্যয়

(NNP = GNP- Depreciation Cost)

মোট জাতীয় উৎপাদন একটি বৃহৎ ধারণা। অপর দিকে নীট জতীয় উৎপাদনের অংশটি সংকীর্ণ। কারণ নীট জাতীয় উৎপাদন, মোট জাতীয় উৎপাদনের একটি অংশ মাত্র।

মোট জাতীয় উৎপাদন ও নীট জাতীয় উৎপাদনের পার্থক্য

মোট জাতীয় উৎপাদন ও নীট জাতীয় উৎপাদনের সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে তাদের মধ্যে নিম্নোক্ত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়-

ক) মোট জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেশের সকল দ্রব্য ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পক্ষান্তরে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্যের সমষ্টি থেকে অবচয়জনিত ব্যয় বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তা নীট জাতীয় উৎপাদনের অন্তর্ভুক্ত হয়।

খ) মোট জাতীয় উৎপাদনের ধারণাটি ব্যাপক। অপরদিকে, নীট জাতীয় উৎপাদনের ধারণাটি সংকীর্ণ। নীট জাতীয় উৎপাদন মোট জাতীয় উৎপাদনের একটি অংশ।

গ) পরিমাপের দিক থেকে মোট জাতীয় উৎপাদন একটি সহজ ধারণা। পক্ষান্তরে, নীট জাতীয় উৎপাদন পরিমাপ করা অপেক্ষাকৃত জটিল ব্যাপার। কারণ, মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় সঠিকভাবে পরিমাপ করা প্রায় অসম্ভব।

ঘ) মোট জাতীয় উৎপাদনের হিসাবের সময় সকল ধরনের নতুন ও পুরাতন যন্ত্রপাতি এবং নির্মাণকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অন্যদিকে নীট জাতীয় উৎপাদন পরিমাপের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র নীট বিনিয়োগ ব্যয়কে বিবেচনা করা হয়।

ঙ) মোট জাতীয় উৎপাদন দেশের অর্থনীতির সঠিক চিত্র প্রদান করতে পারে না। কিন্তু, নীট জাতীয় উৎপাদন ধারণাটি দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দর্পণ হিসেবে কাজ করে। কারণ এটি থেকে দেশের অর্থনীতির সঠিক চিত্র পাওয়া যায়।

৩. মোট দেশজ উৎপাদন

Gross Domestic Product (GDP)

একটি দেশের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমারেখার মধ্যে দেশে অবস্থিত সকল ব্যক্তিবর্গ (দেশি ও বিদেশি) প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে। অর্থাৎ, জিডিপি তে দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত সকল দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের মূল্য হিসাব করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল জনগণ এবং অবস্থানরত বিদেশি মিলে একবছরে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা উৎপাদন করে তা হচ্ছে সেই নির্দিষ্ট বছরে বাংলাদেশের জিডিপি। সুতরাং একটি দেশের জিডিপি থেকে ঐ দেশের মোট উৎপাদন ক্ষমতা তথা অর্থনীতির চিত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

৪. নীট দেশজ উৎপাদন

Net Domestic Product (NDP)

নীট দেশজ উৎপাদন মোট দেশজ উৎপাদনের একটি অংশ। মোট দেশজ উৎপাদন থেকে মূলধনের অবচয়জনিত ব্যয় বাদ দিলে যা পাওয়া যায় তা হলো নীট দেশজ উৎপাদন।

মোট জাতীয় উৎপাদন ও মোট দেশজ উৎপাদনের পার্থক্য

জিএনপি ও জিডিপি ধারণা দুটি পরস্পর খুব ঘনিষ্ঠ হলেও এদের মধ্যে কিছু পার্ধক্য রয়েছে। যেমন-

ক) একটি দেশের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক সীমারেখার মধ্যে সাধারণত এক বৎসরে দেশি ও অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকগণ যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাকর্ম উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্য হচ্ছে মোট দেশজ উৎপাদন বা জিডিপি। অন্যদিকে, একটি দেশের সমস্ত জনগণ দেশে ও বিদেশে সাধারণত এক বৎসরে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্য হচ্ছে জিএনপি। সুতরাং একজন বাংলাদেশি মালয়েশিয়ায় কাজ করে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে তা বাংলাদেশের জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না, অন্তর্ভুক্ত হয় জিএনপিতে। আবার একটি জাপানী ফার্ম বাংলাদেশে যে মুনাফা অর্জন করে তা বাংলাদেশের জিডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হয়, জিএনপিতে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

খ) জিডিপিতে দেশি কিংবা বিদেশি কে উৎপাদন করল তা বিবেচনা না করে শুধুমাত্র দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচিত হয়। পক্ষান্তরে, জিএনপিতে বিদেশে কর্মরত দেশীয় জনগণের আয় ও উৎপাদন ক্ষমতাসহ দেশের সমস্ত নাগরিকের উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচিত হয়।

গ) জিএনপি ও জিডিপি ধারণা দুটির মধ্যে কোনটি বড় কিংবা কোনটি ছোট তা নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। যদি বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিকদের আয়ের তুলনায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কর্মরত বিদেশি নাগরিক ও ফার্মের আয় বেশি হয় তবে বাংলাদেশের জিডিপি বাংলাদেশের জিএনপি থেকে বড় হবে। আবার যদি বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশি নাগরিকদের আয়ের তুলনায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কর্মরত বিদেশি নাগরিক ও ফার্মের আয় কম হয়, তবে বাংলাদেশের জিডিপি বাংলাদেশের জিএনপি থেকে ছোট হবে।

জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিসমূহ

Methods of Measuring National Income

জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য সাধারণত তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এগুলো হলো- (ক) উৎপাদন পদ্ধতি, (খ) আয় পদ্ধতি এবং (গ) ব্যয় পদ্ধতি। নিম্নে জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

ক) উৎপাদন পদ্ধতি: এই পদ্ধতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট বৎসরে দেশে উৎপাদিত সকল দ্রব্য ও সেবাকর্মের আর্থিক মূল্য যোগ করা হয়। এক্ষেত্রে দেশের উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী হিসাবের আওতায় আনা হয়। মোট জাতীয় আয় থেকে যন্ত্রপাতির অবচয়জনিত ব্যয় বাদ দিলে নীট জাতীয় আয় নির্ণয় করা যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

খ) আয় পদ্ধতি: এই পদ্ধতি অনুসারে একটি নির্দিষ্ট বৎসরে উৎপাদনের সকল উপাদানের আয় যোগ করে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়। উপাদানসমূহের আয় বলতে শ্রমিকের মজুরী, জমির খাজনা, মূলধনের সুদ এবং সংগঠনের মুনাফা বুঝায়। সুতরাং আয় পদ্ধতিতে সমস্ত মজুরী, নীট খাজনা, নীট সুদ এবং নীট মুনাফা যোগ করে জাতীয় আয় নির্ণয় করা হয়। যুক্তরাজ্যে এ পদ্ধতিতে জাতীয় আয় পরিমাপ করা হয়।

গ) ব্যয় পদ্ধতি: এই পদ্ধতি অনুসারে কোন দেশের সরকারি ও বেসরকারি খাতে ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় যোগ করে জাতীয় আয় হিসাব করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে দেশে উৎপন্ন দ্রব্য ও সেবাকর্মের একাংশ ভোগের ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয় যাকে ভোগ ব্যয় বলে। অবশিষ্ট অংশ সঞ্চয় হয় যা পরবর্তীতে বিনিয়োগ ব্যয় হিসেবে ব্যয়িত হয়। একে বিনিয়োগ ব্যয় বলে। সুতরাং ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় হিসাবের মাধ্যমে জাতীয় আয় পরিমাপ করা যায়। অর্থাৎ কোন দেশে এক বৎসরে সমস্ত জনগণ ভোগ্যপণ্য ও সেবাকর্ম ক্রয় করতে যে পরিমাণ অর্থ খরচ করে তার সাথে দেশের মোট বিনিয়োগ ব্যয় যোগ করে জাতীয় আয় পাওয়া যায়। জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য এ পদ্ধতির ব্যবহার খুবই কম।

উল্লেখ্য, সকল পদ্ধতিতেই জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে কতগুলো সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়।

বাংলাদেশে জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি

Method of Measuring National Income in Bangladesh

সাধারণত বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরো (বিবিএস) বাংলাদেশের জাতীয় আয় হিসাব বা পরিমাপ করে থাকে। পরিসংখ্যান ব্যুরো বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করে। তবে দেশে জাতীয় আয় পরিমাপের প্রয়োজনীয় তথ্যের একান্ত অভাব রয়েছে। প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাবে বাংলাদেশে জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি ও আয় পদ্ধতি উভয়ই অনুসরণ করা হয়। জাতীয় আয় পরিমাপের উদ্দেশ্যে সমগ্র অর্থনীতিকে পনেরটি (১৫ টি) প্রধান খাতে বিভক্ত করা হয়। এই খাতগুলো হলো- (১) কৃষি, (২) মৎস্য, (৩) শিল্প, (৪) পরিবহন ও যোগাযোগ, (৫) নির্মাণ, (৬) লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, (৭) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সম্পদ, (৮) ব্যাংক ও বীমা, (৯) পাইকারি ও খুচরা বিপণন, (১০) গৃহায়ণ, (১১) কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা, (১২) শিক্ষা খাত, (১৩) স্বাস্থ্য সেবা, (১৪) খনিজ ও খনন, (১৫) হোটেল ও রেস্তরা। এই পনেরটি প্রধান খাতের মধ্যে কৃষি ও শিল্পকে আবার কয়েকটি উপখাতে বিভক্ত করা হয়। অবশিষ্ট তেরটি খাতের জাতীয় আয় পরিমাপের ব্যাপারে মূল্য সংযোজন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এই সমস্ত মূল্য সংযুক্তি নির্ণয় করার জন্য দ্রব্য প্রবাহ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের পরিমাণ অত্যন্ত কম বলে এই খাতে মূল্য সংযুক্তির মাত্রাও কম। এই ক্ষেত্রে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যের উপর ভিত্তি করে খনিজ সম্পদের মূল্য সংযুক্তি নির্ণয় করা হয়। কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে এদের উপ-খাতগুলোর আলাদা আলাদা হিসেব করা হয়। নিম্নে কৃষি ও শিল্পের উপখাতগুলো আলোচনা করা হলো-

১) **কৃষি:** কৃষি খাতকে মোট চারটি উপখাতে বিভক্ত করা হয়, যথা- (ক) কৃষিপণ্য, (খ) পশুপালন, (গ) বন ও (৪) মৎস্য। অতি সম্প্রতি মৎস্য উপখাতটিকে বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের হিসাবে একটি পৃথক খাত হিসেবে দেখানো হচ্ছে।

(ক) কৃষিপণ্য: কৃষি পণ্যের জাতীয় উৎপাদন পরিমাপের ক্ষেত্রে মূল্য সংযুক্তি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। এই খাতে উৎপাদনের আর্থিক মূল্য থেকে সার, কীটনাশক, ঔষধ, অপচয় প্রভৃতি বাদ দিয়ে মূল্য সংযুক্তি নির্ণয় করা হয়।

(খ) পশুপালন: পশুপালন খাতে উপকরণের ব্যয় সম্পর্কিত তথ্যের একান্ত অভাব রয়েছে। ফলে এই ক্ষেত্রে বাজার মূল্যকেই জাতীয় উৎপাদনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

(গ) বন: বন উপখাতেও উপকরণের মূল্য সম্পর্কিত তথ্যের একান্ত অভাব রয়েছে। ফলে এই খাতে উৎপাদনের মূল্যের তিন শতাংশ বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে তাকেই মূল্য সংযুক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

(ঘ) মৎস্য: মৎস্য উপখাতেও মোট উৎপাদনের মূল্য থেকে শতকরা তিন ভাগ মূল্য বাদ দিয়ে মূল্য সংযুক্তি নির্ণয় করা হয়।

২) **শিল্প:** শিল্প খাতকে বৃহদায়তন শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প এই দুইভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) **বৃহদায়তন শিল্প:** বৃহদায়তন শিল্পের মূল্য সংযুক্তি শিল্প উৎপাদন ও পাইকারি মূল্যের সূচকের সাহায্যে পরিমাপ করা হয়।

(খ) **ক্ষুদ্রায়তন শিল্প:** ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের ক্ষেত্রে মূল্য সংযুক্তি নির্ণয় করার জন্য **১৯৭৬** সনের ক্ষুদ্র শিল্প সম্পর্কিত নমুনা জরিপ এবং পাইকারি মূল্যের সূচক ব্যবহার করা হয়।

সারসংক্ষেপ

একটি দেশের আর্থিক মূল্যে পরিমাপযোগ্য দ্রব্য ও সেবাসামগ্রির বার্ষিক সর্বমোট প্রবাহই হলো জাতীয় আয়। একটি দেশের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক সীমারেখার মধ্যে অর্থাৎ স্বতন্ত্র দেশের মধ্যে অবস্থিত সকল ব্যক্তিবর্গ (দেশি ও বিদেশি) প্রাপ্ত সম্পদ ব্যবহার করে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন করে তার আর্থিক মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন বা GDP বলে। সাধারণত বাংলাদেশ পরিসংখান ব্যুরো (বিবিএস) বাংলাদেশের জাতীয় আয় হিসাব বা পরিমাপ করে থাকে। পরিসংখ্যান ব্যুরো বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করে।

পাঠ-৭.২ জাতীয় আয় পরিমাপে সমস্যা
Problems in Measuring National Income

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জাতীয় আয় পরিমাপে সমস্যাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশে জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যাসমূহের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জাতীয় আয় পরিমাপে অসুবিধা
Demerits of Measuring National Income

একটি দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করার ক্ষেত্রে বেশকিছু অসুবিধা দেখা দেয়। জাতীয় আয় পরিমাপ করা যেমন প্রয়োজন তেমনি জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করাও প্রয়োজন। এক্ষেত্রে অসুবিধাগুলো সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার সাথে সাথে জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যা কমানো সম্ভব হয়। যে কোন দেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় নিম্নোক্ত অসুবিধাসমূহ লক্ষণীয়-

১. **অর্থমূল্য নির্ধারণের অসুবিধা:** জাতীয় আয় অর্থের মাধ্যমে অর্থাৎ আয়কে সংখ্যাতাত্ত্বিকভাবে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু সমাজে অনেক পণ্য ও সেবাসামগ্রী রয়েছে যেগুলো অর্থের অংকে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। যেমন- একজন কৃষক তার উৎপাদিত ফসল নিজের পরিবারের ভোগের ক্ষেত্রে ব্যবহার করলে অথবা পরিবারের অন্যান্য সদস্য পরিবারে যেসব সেবা প্রদান করে সেগুলো অর্থের অংকে প্রকাশ করা সম্ভব নয় বলে জাতীয় আয়ের হিসাব থেকে এদেরকে বাদ দেওয়া যায় না। ফলে জাতীয় আয়ের পরিমাণ প্রকৃত পরিমাণের চেয়ে কম হয়ে পড়ে।

২. **পরিসংখ্যানের অভাব:** জাতীয় আয় পরিমাপ করার জন্য যে সমস্ত তথ্যাদির প্রয়োজন তা সর্বত্র পাওয়া যায় না। যে কোন দেশের জনসাধারণ তাদের আয়ের সঠিক হিসাব রাখতে অভ্যস্ত নয় বলে জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা খুব কঠিন। এছাড়া সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত নির্ভুল নয়। এমনকি উন্নত দেশেও সরকারি পরিসংখ্যানের একাংশ নিছক ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত।

৩. **মূল্যস্তরের উঠানামা:** মূল্যস্তর সবসময় ঠিক থাকেনা। মূল্যস্তর উঠানামার সাথে সাথে অর্থের নিজস্ব মূল্য পরিবর্তিত হয়। তাই অর্থের মাধ্যমে জাতীয় আয় পরিমাপ করে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। দেশে মুদ্রাস্ফীতির সময় মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় এবং তখন উৎপাদন বৃদ্ধি না হওয়া সত্ত্বেও আর্থিক জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের অবস্থা সমস্যার সৃষ্টি করে। আবার মূল্যস্তর হ্রাস পেলে উৎপাদনের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকলেও জাতীয় আয় কম হয়ে পড়ে। কাজেই অর্থের মূল্য পরিবর্তিত হলে জাতীয় আয়ের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না।

৪. **দ্বৈত গণনার আশংকা:** জাতীয় আয় পরিমাপের আরেকটি সমস্যা হলো অনেক সময় একই পণ্য একাধিকবার গণনা করা হয়ে থাকে যাক দ্বৈত গণনার সমস্যা বলা হয়। যেমন, সুতা ও কাপড়ের ক্ষেত্রে যদি সুতা ও কাপড় উভয়ের মূল্যকে জাতীয় আয়ের হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তবে সেটি সঠিক হবে না। এক্ষেত্রে জাতীয় আয় প্রকৃত পরিমাণের চেয়ে বেশি হবে। এই সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় হলো জাতীয় আয় হিসাবের সময় মধ্যবর্তী পর্যায়ের দ্রব্যগুলোর মূল্য হিসেব না করে কেবল চূড়ান্ত দ্রব্যগুলোর মূল্য হিসেব করা।

৫. **ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় (Depreciation Cost):** উৎপাদন কাজে সারা বৎসর ধরে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে যন্ত্রপাতির অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। এই ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় জাতীয় আয় থেকে বাদ দিতে হয়। অথচ এই ব্যয়ের সঠিক হিসাব নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব।

৬. **পরোক্ষ কর:** সরকার পণ্যের উপর পরোক্ষ কর আরোপ করলে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। তখন দ্রব্যের বাজার দামে জাতীয় আয় হিসাব করলে জাতীয় আয় বেশি হবে। তাই জাতীয় আয় হিসাব করার সময় পরোক্ষ কর বাদ দিয়ে যে দাম পাওয়া যায় তাই কেবল হিসেবের সময় ধরতে হবে।

৭. **হস্তান্তর আয়:** জাতীয় আয় হিসাবের সময় হস্তান্তর আয় বাদ দিতে হয়। কারণ, উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ না করেও এই সমস্ত আয় পাওয়া যায়। সুতরাং জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময় কোন্‌টি হস্তান্তর আয় আর কোন্‌টি উৎপাদন কার্য হতে সৃষ্ট আয় সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হয়।

৮. **আন্তর্জাতিক বাণিজ্য:** আন্তর্জাতিক বাণিজ্যও জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করে। যে সমস্ত দ্রব্য বর্তমানে অন্য দেশে রপ্তানি করা হয় তা জাতীয় আয়ের হিসাবে ধরা হয় না। কারণ ঐ সমস্ত দ্রব্যের দাম মোট উৎপন্ন দ্রব্যের দামের সঙ্গে আগেই হিসাব করা হয়ে গেছে। এছাড়াও আয়ের সঠিক হিসাব পেতে হলে জাতীয় আয়ের মধ্যে আন্তর্জাতিক লেনদেনের শুধু উদ্বৃত্ত অংশটুকু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

বাংলাদেশে জাতীয় আয় পরিমাপের সমস্যাবলী

Problems of Measuring National Income in Bangladesh

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও জাতীয় আয় পরিমাপ করার ক্ষেত্রে কতগুলো অসুবিধা হয়। বাংলাদেশের জাতীয় আয় পরিমাপ করতেও অনেকগুলো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ এখনো বাংলাদেশে কাঠামোগত অনেক দুর্বলতা রয়েছে।

বাংলাদেশে জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে প্রধান অসুবিধাগুলো নিম্নরূপ:

১. **সঠিক তথ্য-উপাত্তের অভাব:** বাংলাদেশে জাতীয় আয় পরিমাপের জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক ও নির্ভরযোগ্য পরিসংখ্যানের অভাব রয়েছে। তথ্য-উপাত্তের স্বল্পতা ও তাদের উপর নির্ভর করার অসুবিধা বাংলাদেশে জাতীয় আয় পরিমাপ করার পথে প্রধান অন্তরায়।

২. **অশিক্ষিত জনসাধারণ:** বাংলাদেশের জনসংখ্যার ক্ষেত্রে অশিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশি হওয়ায় তাদের আয়ের সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। সরকার বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে গেলে জনসাধারণের নিকট থেকে খুব কমই সহযোগিতা পান।

৩. **আত্মতোষণ খাতের উৎপাদন:** বাংলাদেশে উৎপন্ন দ্রব্যের অধিকাংশই অভ্যন্তরীণ জনগোষ্ঠী ভোগ করে। ফলে ঐ সমস্ত দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় না বলে জাতীয় আয়ের হিসাব আরও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

৪. **পেশাগত বিশেষীকরণের অভাব:** আমাদের দেশে উৎপাদন ধারা প্রধানত পারিবারিক পর্যায়ে পরিচালিত হয়। একই পরিবারে বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য উৎপাদন হয়। এগুলোর সঠিক হিসাব রাখা কঠিন ব্যাপার। কারণ বাংলাদেশে পেশাগত বিশেষীকরণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

৫. **অনুন্নত বাজার ব্যবস্থা:** বাংলাদেশে বাজার ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত। ফলে এ দেশে দ্রব্যসামগ্রীর সঠিক মূল্য নিরূপণ করা খুব কঠিন। তারপর বাংলাদেশে দামস্তরও স্থিতিশীল নয়। কাজেই বাজার দামের উপর নির্ভর করে জাতীয় আয় পরিমাপ করলে তা সঠিক হয় না।

৬. **উৎপাদনের সঠিক হিসাবের অভাব:** বাংলাদেশে কৃষির পাশাপাশি শিল্প দ্রব্যেরও উৎপাদনের সঠিক তথ্য রাখা যায় না। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদনের তথ্য রাখা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। জাতীয় আয় সঠিকভাবে পরিমাপ করার ক্ষেত্রে এটিও একটি সমস্যা।

৭. **সামাজিক সচেতনতার অভাব:** বাংলাদেশের বেশিরভাগ জনগণ তাদের আয় গোপন রাখে। কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে অনেক সময় এমনটি করে থাকে। অর্থাৎ এদেশের মানুষ সামাজিকভাবে এখনো কিছুটা অসচেতন।

৮. **বিনিময় প্রথা:** বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কোথাও কোথাও এখনো বিনিময় প্রথা প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে এখনো গ্রামাঞ্চলে অনেক মানুষ ফেরিওয়ালাদের নিকট থেকে ধান-চালের বিনিময়ে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে। এসব ক্ষেত্রে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য নিরূপণ করা কঠিন কাজ।

৯. **মূলধনের অবচয় পরিমাপ:** পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই মূলধনের অবচয়জনিত ব্যয় রয়েছে। বাংলাদেশেও উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির অবচয়জনিত ব্যয় রয়েছে। এই ব্যয়ের পরিমাণ হিসাব করা খুবই দুঃসাধ্য কাজ। কাজেই এটিও জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি সমস্যা।

সারসংক্ষেপ

জাতীয় আয় পরিমাপ করা যেমন প্রয়োজন তেমনি জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করাও প্রয়োজন। অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মত বাংলাদেশেও জাতীয় আয় পরিমাপ করার ক্ষেত্রে বেশকিছু অসুবিধা হয়।

পাঠ-৭.৩ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ
Savings and Investment

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সঞ্চয় অপেক্ষক কী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- বাংলাদেশে স্বল্প সঞ্চয়ের কারণসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন এবং
- বিনিয়োগ ও বাংলাদেশে বিনিয়োগের নির্ধারকসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সঞ্চয়
Savings

সাধারণত ব্যক্তির আয়ের যে অংশ ভোগের পর অবশিষ্ট থাকে তাকে সঞ্চয় বলে। অর্থাৎ আয় ও ভোগ ব্যয়ের পার্থক্যকে সঞ্চয় বলে। সামষ্টিক অর্থনীতিতে সঞ্চয় একটি গুরুত্বপূর্ণ চলক। জাতীয় আয়ের যে অংশ সমাজের ব্যক্তি, গোষ্ঠীসহ সরকারি ও বেসরকারি ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সঞ্চিত হয় তাই সঞ্চয়।

গাণিতিক ভাবে সঞ্চয় অপেক্ষক -

$$S = f(Y)$$

এখানে , S = সঞ্চয়

Y = জাতীয় আয়

সঞ্চয় হলো জাতীয় আয় ও ভোগ ব্যয়ের পার্থক্য। অর্থাৎ

$$S = Y - C$$

এখানে , Y = জাতীয় আয়

C = ভোগ ব্যয়

বাংলাদেশে স্বল্প সঞ্চয়ের কারণসমূহ
Causes of little Saving in Bangladesh

বাংলাদেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ স্বল্প। কারণ এদেশে বরাবরই আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশি হয়ে থাকে। তবে বিভিন্ন খাতে কিছু কিছু সঞ্চয় হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত বা প্রতিষ্ঠানিক সঞ্চয় ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে। অন্য দিকে সরকারি সঞ্চয় সরকারি বিনিয়োগ তথা দেশের অনুন্নয়ন বা উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে যা সরকার বাজেটের মাধ্যমে সমন্বয় করে থাকে। বাংলাদেশের স্বল্প সঞ্চয়ের কারণসমূহ নিম্নরূপ:

১। **জনগণের স্বল্প আয়:** সঞ্চয় আয়ের উপর নির্ভরশীল। আয় বাড়লে সঞ্চয় বাড়ে, আয় কমলে সঞ্চয় কমে। যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের আয় কম তাই সঞ্চয় কম।

২। **দাম স্তরের উঠানামা:** দাম স্তর উঠানামা করলে জনগণের সঞ্চয় প্রবণতা প্রভাবিত হয়। সাধারণত পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেলে জনগণের আর্থিক সঞ্চয় বৃদ্ধি না পেয়ে বরং কমে যায়। এক্ষেত্রে দাম পূর্বের অবস্থায় থাকলে যে পরিমাণ সঞ্চয় হতো দাম বৃদ্ধির কারণে সঞ্চয় হ্রাস পাবে।

৩। **সঞ্চয়ের ইচ্ছার অভাব:** বাংলাদেশের মানুষের সঞ্চয়ের ইচ্ছা কম। আর অনেক সময় ইচ্ছা থাকলেও সঞ্চয় করা সম্ভব হয় না কারণ আয়ের তুলনায় ভোগেরসামগ্রীসমূহে মানুষ বেশি ব্যয় করে থাকে।

৪। **সুদের হারের হ্রাস-বৃদ্ধি:** দেশের ব্যাংক ব্যবস্থায় সুদের হার নিয়মিতই উঠা-নামা করে। এতে প্রত্যাশিত সঞ্চয় করা বিঘ্নিত হয়।

৫। **দুর্বল প্রত্যাশা:** বাংলাদেশে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করায় জনগণের আয় প্রত্যাশা দুর্বল থাকে। এতে সঞ্চয় কম হয়ে থাকে।

৬। **সামাজিক নিরাপত্তার অভাব:** বাংলাদেশে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পরিধি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল। তাই জনগণের একটি বড় অংশের জীবনধারণের জন্য নিজেদের অর্জিত আয়কে জীবন নির্বাহের জন্য ব্যয় করতে হয় যে কারণে সঞ্চয় হ্রাস পায়।

৭। **অনুন্নত ব্যাংক ব্যবস্থা:** বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থা এখনো উন্নত হতে পারে নি। জনগণের সঞ্চয় সহজে আমানত হিসেবে গ্রহণ করার যথেষ্ট প্রণোদনা না দেওয়ায় সঞ্চয় প্রবণতা হ্রাস পায়।

৮। **ত্রুটিপূর্ণ ও অসংঘটিত মূলধন বাজার:** এদেশের মূলধন বাজার তথা শেয়ার বাজার-এর অবস্থা খুবই নাজুক থাকে যে কারণে দেশের জনগণ তাদের সঞ্চয় স্পৃহা হারিয়ে ফেলে। ফলে সঞ্চয় কম হয়।

৯। **দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র:** বাংলাদেশের একটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা হলো দারিদ্র্য। এদেশে স্বল্প মূলধন তাই স্বল্প উৎপাদন। আর তাই স্বল্প আয়। ফলে সঞ্চয় স্বল্প। কাজেই বাংলাদেশে জনগোষ্ঠীর একটি অংশ দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রে আবর্তিত হওয়ায় এদেশে সঞ্চয় কম হয়ে থাকে।

সঞ্চয় বৃদ্ধির উপায়

Method of Increasing Savings

১। **আয় বৃদ্ধি করা:** বাংলাদেশে সঞ্চয় বৃদ্ধি করতে হলে উৎপাদনের মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করতে হবে। যদি জনগণের আর্থিক আয় ভোগের তুলনায় বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়।

২। **সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি করা:** বাংলাদেশে জনসাধারণকে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে নানাবিধ আকর্ষণীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এতে মানুষের সঞ্চয় প্রবণতা বাড়বে।

৩। **দামস্তর হ্রাস:** দেশের অভ্যন্তরে পণ্যের দামস্তর হ্রাস পেলে জনগণের হাতে তাদের আয়ের কিছু অংশ থেকে যাবে যা সঞ্চয় হিসেবে বিবেচিত।

৪। **সুদের হার বৃদ্ধি করা:** ব্যাংক ব্যবস্থায় আমানতের সুদের হার বৃদ্ধি করলে মানুষের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। কারণ ব্যাংকে মূলধনের বিপরীতে মুনাফা সঞ্চয় বাড়াতে সাহায্য করবে।

৫। **অভ্যাস ও রুচির পরিবর্তন:** দেশের জনগণ দৈনন্দিন জীবন ধারণের ক্ষেত্রে মিতব্যয়ী হলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পেতে পারে। এক্ষেত্রে ভোগ অভ্যাস পরিহার বা যৌক্তিক করার সাথে সাথে রুচিরও পরিবর্তন করতে হবে।

৬। **মুদ্রা ও মূলধন বাজার সুসংগঠিত করা:** দেশের বিরাজমান মুদ্রা ও মূলধন বাজারকে আরও সুসংগঠিত করতে হবে। মূলধন বাজারের ত্রুটি বিশেষ করে শেয়ার বাজারকে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে শেয়ারে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে আকৃষ্ট হয়।

৭। **রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা করা:** বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা একটি সাধারণ ঘটনা। এই অস্থিতিশীলতা জনগণের দৈনন্দিন জীবনে আয় ও সঞ্চয়কে বাধাগ্রস্থ করে। তাই জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন স্থিতিশীল করতে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দূর করতে হবে তাতে জনগণের মধ্যে সঞ্চয় প্রবণতা বাড়বে।

জিডিপিতে সঞ্চয়ের অবদান

Contribution of Savings in GDP

২০১০-১১ অর্থবছরে দেশজ সঞ্চয় ও জাতীয় সঞ্চয় হার ছিল যথাক্রমে জিডিপির ১৯.৬০% ও ২৮.৪০%। ২০১৮ সালে দেশজ সঞ্চয়ের হার ছিল ২৭.৪% যা ২০১৯ সালে বেড়ে দ্বাড়ায় ২৯.৫% এ। ২০০৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত গড় দেশজ সঞ্চয় হার ছিল ২৯.১%। ২০১৬ সালে এই হার সর্বোচ্চ ৩০.৮% ছিল। আর গত কয়েক বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন হার ছিল ২০১৮ সালে, যা ২৭.৪%। উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

বিনিয়োগ
Investment

সাধারণভাবে বিনিয়োগ বলতে বুঝায় মূলধন ব্যবহার করে মুনাফা অর্জন করাকে। কিন্তু অর্থনীতিতে কোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান মূলধন সামগ্রীর সাথে অতিরিক্ত সংযোজনকে বিনিয়োগ বলে। আরও স্পষ্ট করে বললে উৎপাদন খাতে ব্যবহৃত সকল মূলধন দ্রব্য অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, ঘরবাড়ি ইত্যাদি স্থায়ী দ্রব্য গঠনে যে অর্থ নিয়োজিত হয় তাকে বিনিয়োগ বলে। সুতরাং বলা যায় মূলধন মজুদের বৃদ্ধিই হচ্ছে বিনিয়োগ।

বাংলাদেশে বিনিয়োগের নির্ধারকসমূহ
Determinants of Investment in Bangladesh

বাংলাদেশে বিনিয়োগ কতিপয় বিষয় দ্বারা নির্ধারিত হয়। এগুলোকে বাংলাদেশের বিনিয়োগের নির্ধারক হিসেবে গণ্য করা হয়। এই নির্ধারকগুলো বিনিয়োগের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নিম্নে বাংলাদেশের বিনিয়োগের নির্ধারকসমূহ আলোচনা করা হলো:

১। **মূলধনের প্রাচুর্যতা:** দেশে মূলধনের পরিমাণ বেশি হলে মূলধন সহজলভ্য হয়। ফলে মূলধনের যোগান দাম কমে এবং মুনাফার পরিমাণ বাড়ে। এর ফলে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়।

২। **উদ্যোক্তা শ্রেণি:** দক্ষ উদ্যোক্তা বিনিয়োগের জন্য অপরিহার্য। উদ্যোক্তা দক্ষ হলে ব্যবস্থাপনা খরচ কম হয়। ফলে গড় উৎপাদন খরচ কমে এবং বিনিয়োগ বাড়ে।

৩। **প্রাকৃতিক সম্পদ:** দেশে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ থাকলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে। অন্যথায়, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা ও পর্যাপ্ত মূলধন থাকলেও যদি মূল্যবান খনিজ সম্পদ যথা গ্যাস ও তেল কম থাকে তাহলে বিনিয়োগ কম হবে।

৪। **মানব সম্পদ:** দক্ষ মানব সম্পদ দেশের মূলধন ও প্রাকৃতিক সম্পদকে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে পারে। ফলে বিনিয়োগ বাড়ে। মানব সম্পদ অদক্ষ হলে বিনিয়োগ কমে।

৫। **আয়স্তর:** আয়স্তর বেশি হলে ভোগ্য পণ্যের চাহিদা বাড়ে। এতে বিক্রয়ের পরিমাণ বাড়ে এবং মুনাফা বৃদ্ধি পায়। ফলে বেশি মুনাফার প্রত্যাশায় বিনিয়োগ বাড়বে। বিপরীত অবস্থায় বিনিয়োগ কমবে।

৬। **ভোগ প্রবণতা:** ভোগ প্রবণতা বেশি হলে ভোগ্য পণ্যের চাহিদা বাড়ে, এতে বিক্রয়ের পরিমাণও বাড়ে। ফলশ্রুতিতে মুনাফা বাড়ে এবং সেই সাথে বিনিয়োগও বাড়ে।

৭। **বৈদেশিক সম্পর্ক:** বৈদেশিক সম্পর্ক ভালো হলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হয়। ফলে রপ্তানির ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। তার মাধ্যমে ব্যবসায়িক মুনাফার প্রত্যাশা বাড়ে এবং বিনিয়োগ প্রসারিত হয়।

৮। **রাজস্ব নীতি:** সরকারি ব্যয় এবং কর বিনিয়োগকে প্রভাবিত করে। ভর্তুকি বাড়লে এবং কর হার হ্রাস করলে ব্যবসায়িক মুনাফা বাড়ে ফলে বিনিয়োগ বাড়ে। আবার ভর্তুকি কমালে এবং কর হার বাড়ালে মুনাফা কমে এবং সাথে সাথে বিনিয়োগ কমে যায় যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে সঞ্চয়ের উপর।

৯। **আর্থিক ও ঋণ নীতি:** রাজস্ব নীতির মত আর্থিক নীতিও দেশের বিনিয়োগকে প্রভাবিত করে। সমপ্রসারণমূলক ঋণ নীতি এবং সহজ ঋণ পরিশোধ নীতি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে সংকোচনমূলক ঋণ নীতি ও জটিল ঋণ পরিশোধ নীতি বিনিয়োগ হ্রাস করে।

১০। **আইন শৃংখলা ও নিরাপত্তা:** দেশের আইন শৃংখলা ও নিরাপত্তা ব্যপকভাবে বিনিয়োগকে প্রভাবিত করে। অন্যান্য সবকিছু অনুকূলে থাকলেও যদি আইন শৃংখলা পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকে তবে বিনিয়োগকারীরা নিরুৎসাহিত হয়। পক্ষান্তরে আইন শৃংখলা অনুকূলে থাকলে বিনিয়োগ প্রসারিত হয় এবং সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়।

১১। **উন্নত প্রযুক্তি:** উন্নত প্রযুক্তি বিনিয়োগের অন্যতম নির্ধারক। নতুন নতুন উন্নত প্রযুক্তি নতুন নতুন বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করে। এছাড়াও উন্নত প্রযুক্তি থাকলে কম ব্যয়ে উৎপাদন করা যায় তাতে মুনাফা বেশি হয় এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

সুতরাং বলা যায় উপরোক্ত নির্ধারকসমূহ বিনিয়োগের নির্ধারক এবং সাথে সাথে বাংলাদেশের বিনিয়োগের শক্তিশালী নির্ধারক হিসেবে কাজ করে।

সারসংক্ষেপ

জাতীয় আয়ের যে অংশ সমাজের ব্যক্তি, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সঞ্চিত হয় তাই সঞ্চয়। অর্থনীতিতে কোন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান মূলধন সামগ্রীর সাথে অতিরিক্ত সংযোজনকে বিনিয়োগ বলে। স্পষ্ট করে বললে উৎপাদন খাতে ব্যবহৃত সকল মূলধন দ্রব্য অর্থাৎ যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, ঘরবাড়ি ইত্যাদি স্থায়ী দ্রব্য গঠনে যে অর্থ নিয়োজিত হয় তাকে বিনিয়োগ বলে।

ইউনিট মূল্যায়ন

১। জাতীয় আয়ের সংজ্ঞা দিন। জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিগুলো আলোচনা করুন। (Define National Income. Discuss the method of measuring national Income).

২। **GNP** ও **NNP** বলতে কী বুঝায়? **GNP** ও **NNP** এর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন। (What is meant by GNP & NNP? Distinguish between GNP & NNP.)

৩। **GNP** ও **GDP** এর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন। (Distinguish between GNP & GDP.)

৪। বাংলাদেশে জাতীয় আয় পরিমাপ পদ্ধতি আলোচনা করুন। (Discuss the method of measuring national Income in Bangladesh).

৫। সংক্ষেপে বাংলাদেশে জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ আলোচনা করুন। (Breifly discuss the problems of measuring national Income in Bangladesh).

৬। সঞ্চয় কী এবং সঞ্চয় অপেক্ষক কী? (What is savings and what is savings function?)

৭। বিনিয়োগ কী? বাংলাদেশে বিনিয়োগের নির্ধারকসমূহ কী? বর্ণনা করুন। (What is Investment? what are the determinants of Investment in Bangladesh? Describe.)